গ দ্য

জয় গোস্বামী

# সুধীর চক্রবর্তী ব্যক্তিগত চোখে

১৯৭৭ সালে সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। খুব সামান্য আলাপ। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই বারো বছর এমন সময় যায়নি, যখন আমি প্রতি সপ্তাহে ওঁর বাড়ি যেতাম না। যদি কখনো হাসপাতালে থেকেছি, বা অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে পড়েছি তাহলে হয়তো যাইনি। এমনও হয়েছে যে, সপ্তাহে দু'বার তিনবারও ওঁর বাড়িতে গিয়েছি। ওঁকে দেখেছি। এমনকী গত মাসেও ওঁর বাড়িতে গিয়েছি, ওঁকে যেমনভাবে দেখেছি, এ হল সেই অভিজ্ঞতা। আমি দেখেছি যে মানুষটি হয়তো বাংলার লোকধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন— আর যেখানে বক্তৃতা দেবেন সেখানে আসবেন বিভিন্ন গবেষক, যাঁরা নিজেরা পিএইচ.ডি করেছেন, অনেক বিদগ্ধ ছাত্র এবং যাঁদের অধীনে অনেকে পিএইচ.ডি করেন— এমন সব শ্রোতা। সেখানে সুধীরবাবু বক্তৃতা দেবেন এবং সেটি লিখিত বক্তৃতা নয়, দাঁড়িয়ে সরাসরি বলে যাবেন। তাঁর আগে উনি উঠলেন ট্রেনে ভেণ্ডারদের কামরায়। সেখানে সবাই বাজারের ফলমূল, শাকসবজি নিয়ে ওঠে। সেই কম্পার্টমেন্টে সুধীরবাবু উঠলেন। তারপর ভেণ্ডারদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করতে করতে, হাসি-ঠাট্টা করতে করতে চলে গেলেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তিনি অসামান্য বক্তৃতা দিলেন। তাতে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সেই বিষয়ের খুব ভেতরকার জটিল নানারকম সব প্রশ্ন আসতে শুরু করল। সব উত্তর তিনি বিশ্লেষণ করে বলতে লাগলেন।

তারপর ফেরবার পথে ট্রেনে উনি উঠলেন ডেলি প্যাসেঞ্জারদের গাড়িতে। সেখানে ডেলি প্যাসেঞ্জাররা সবাই তাস খেলছিল। ওঁকে দেখে সবাই বলল 'আজকে স্যার এসেছেন, থাক্, আজকে আর তাস খেলা হবে না। তারা তাদের তাস খেলা বন্ধ করে দিল এবং সকলে সুধীরবাবুকে ঘিরে বসল। সুধীরবাবু নানারকম মজার মজার এবং লোকজীবনের গল্প করতে শুরু করলেন। প্রতিদিনের জীবনে যা দেখা যায় এবং প্রত্যেকদিন রাস্তাঘাটে যা দেখা যায় সেসব গল্প— তিনি শুনতে লাগলেন ওই ডেলি প্যাসেঞ্জারদের এক-একজনের ব্যক্তিগত জীবন। তারাও তাদের নিজেদের কথা বলতে লাগল। তিনি শুনতে শুনতে ফিরে এলেন। এর মধ্যিখানটায় উনি কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সত্যিকারের বিদগ্ধ পণ্ডিতরা আছেন, সেখানে হয়তো শ্রোতাদের মধ্যে আছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষ— তাঁদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে এলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান অর্জন করলেন। এরপর ফিরে এলেন আবার একেবারে সাধারণ মানুষদেরই সঙ্গ-সাহচর্য নিতে নিতে। উনি বাড়িতে প্রতিদিন এখনও বারো পৃষ্ঠা করে লেখেন। সকালবেলা এবং সন্ধেবেলা।

দীর্ঘকাল ধরে ওঁর বড়ো মেয়ে খুবই অসুস্থ। এই যে প্রতিবন্ধী সন্তান, যে নিজের বাবা মা-র নামও বলতে পারে না, যে নিজের নামটাও জানে না— এই সমস্ত কাজ করার পর তাকে সেবা করা, সময় দেওয়া, কখনও স্নান করানো, তাকে নিজের হাতে খাওয়ানো— এগুলি এই আশি বছর বয়সেও প্রায়শই সুধীর চক্রবর্তী নিজে করেন। ওঁদের বাড়িতে মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দু'জন মহিলা বিভিন্ন সময়ে কাজের সহযোগিতা করার জন্য ছিল। তাদের স্কুলে ও কলেজে পড়িয়ে নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া— এই সমস্তটাই সুধীরবাবু করেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে করেছেন। আমরা যাঁরা ওঁদের বাড়িতে যাতায়াত করি তাঁরা এটা দেখতে পেয়েছি। যখন ওদের মধ্যে একটি মেয়ের গুটিবসন্ত হল এবং সে অন্য ধর্মাবলম্বী— আমি এই ধর্মের কথাটা বারবার বলছি এই কারণে যে, আমাদের দেশে এখনও এই ধর্ম নিয়ে খুবই বাছবিচার, সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কার এবং ধর্মবিদ্বেষ আছে। সুধীরবাবুর স্ত্রী, আমাদের নিবেদিতা বউদি সে সময় ওই মেয়েটির মশারির মধ্যে ঢুকে নিজের হাতে তার পরিচর্যা করতেন। যেকোনো মুহূর্তে তাঁরও সংক্রমণ ঘটতে পারত। কিন্তু সেই সংক্রমণ হওয়ার ভয় এড়িয়ে তিনি সেবার কাজ করেছেন।

সুধীরবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায়ই রিক্সাচালকদের সঙ্গে গল্প করেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলেন অনেকক্ষণ, তারপর রিক্সায় উঠে পড়লেন। রিক্সাচালকেরা জানে তিনি মাস্টারমশাই। তারা সুধীরবাবুর সঙ্গে তাদের সুখ-দুঃখের গল্প করে, তাদের বাড়ির কথা বলে। আমরা দেখেছি, যখন আমরা কোনো বিদগ্ধ মানুষের কাছে যাই, তখন তাঁর মুখের ভাষা একটু আলাদারকম হয় অনেক সময়ই। কিন্তু সুধীরবাবুর মুখের ভাষা কিন্তু ভিন্ন নয়। তিনি একেবারেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণভাবে কথা বলেন। ওই যে বললাম, তিনি ভেণ্ডারদের কামরাতেও উঠে পড়তেন। সুধীরবাবুর বিভিন্ন লেখার মধ্যে ছড়ানো আছে অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গল্প, অভিজ্ঞতার কথা। যেমন 'সদর মফস্বল' বলে ওঁর একটা বই আছে। সেই বইতে উনি এরকম অনেক কথা লিখেছেন। লোকের মুখ থেকে পাওয়া এইরকম গল্পই শেষ পর্যন্ত কোনো গভীর দার্শনিক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। এই যা উনি লোকমুখে শুনছেন, পরে যখন তা লেখার মধ্যে আনছেন বা আমাদের মুখে বলছেন তখন সেটা হয়ে উঠছে কোনো দার্শনিক সত্যের উপলব্ধি। ওর মধ্য থেকে সেই দর্শনটাকে নিয়ে তিনি আমাদের দিতে পারেন। এমন অনেক কথাই আছে যা তিনি আগে আমাদের বলতেন। পরে সেটা যখন লিখেছেন তখন তা একটা অসামান্য রচনা হয়ে গেছে। তিন-চার ধরনের রচনা উনি একসঙ্গে লিখে গেছেন আমার দেখা অভিজ্ঞতাগুলির কথা আগে বলি।

আমি যখন প্রথম কৃষ্ণনগরে যেতে শুরু করি, তখন যাঁদের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় কৃষ্ণনগরে, তাঁদের কাছে শুনতাম সুধীর চক্রবর্তী একজন এলিট্ পার্সোন্যালিটি। তিনি

এলিট্ মানুষ। গভর্নমেন্ট কলেজের একজন অধ্যাপক এবং তাঁর বাড়িতে অনেক বই আছে। তিনি ধুতি পাঞ্জাবি পরেন। এটাও শুনতাম। আমিও এই হিসেবেই তখন তাঁকে দেখেছিলাম— ১৯৭৭-৮৩। তাঁর সম্পর্কে এইসব কথা প্রচলিত ছিল কেন? কারণ তখনও তাঁর কোনো বই বেরোয়নি। তাঁর প্রথম বই বেরোয়, তখন তাঁর পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে, একান্ন বছর বয়েস। আমরা জানি তিনি প্রায় ৮০টির ওপর বই লিখেছেন। ওইসব বই-ই পঞ্চাশ বছর বয়সের পর লেখা। যাঁদের মুখে আমি ওঁর সম্পর্কে শুনতাম তাঁদের তুলনায় সুধীরবাবুর পরিশ্রম, লেখা এবং মানুষের সঙ্গে মেশা অনেক বেশি। এলিট্ সম্প্রদায়ের লোক বলে কৃষ্ণনগরে তাঁর পরিচিতি থাকলেও তিনি আসলে কিন্তু মিশেছেন খুব নিম্নবর্গের লোকের সঙ্গে। যেমন ওঁর যখন ৬৫ বছর বয়স তখন বীরভূমে মে মাসে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মাথায় গামছা দিয়ে উনি একজন ফকিরের কাছে যাচ্ছেন। সারাদিন প্রায় পাঁচ মাইল হেঁটে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। একটা মানুষ যদি সত্যিকারের এলিট্ হয় তাহলে তার পক্ষে এতখানি শারীরিক পরিশ্রম সহ্য করে বাউল ফকিরদের সঙ্গে ধুলোয় বসে মেলামেশা করা সম্ভব নয়। আমি ওঁর সম্পর্কে যে কথাবার্তাগুলো শুনতাম আর যখন ওঁর সঙ্গে মিশতে শুরু করলাম দেখলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং কবি সাহিত্যিক যারা হয় তারাই একটা ছোটো বৃত্তের মধ্যে থাকে। আর আমি সাধারণত ওই ধরনের লোকের কাছেই কথাগুলো শুনতাম। যে উনি একজন এলিট্, অনেক পড়াশুনা করেন, এই ধরনের লোক। বাড়িতে অনেক বই রেখে পড়াশুনা তো অনেকেই করতে পারেন। কিন্তু কঠিন ব্যাপার হলো যেটা উনি জানতে চান তার জন্য উনি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মাথায় ভিজে গামছা দিয়ে পাঁচ মাইল হাঁটছেন। এরপর উনি যখন সেই ফকিরের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সে বলল— আমার এখন আকাশদশা চলছে। আমায় কেউ কিছু দিলে আমি তবে খাব। নাহলে তো খাওয়া হবে না। আপনারও খাওয়া হবে না। সুধীরবাবু সেটা মেনে নিয়ে ওখানে থেকে গেলেন। তারপর গ্রামের একজন এসে ওই ফকিরকে দুটো বাতাসা দিয়ে গেল। তার মধ্যে একটা সুধীরবাবু খেয়ে জল খেলেন, আর একটা সেই ফকির খেলেন। সেটা খেয়ে ওই খড় বিছানো মেঝেতে কম্বল পেতে ওই ফকিরের পাশে উনি শুয়ে পড়লেন রাত্রিবেলা। এমনও হয়েছে যে তিনি একজন ফকিরের কাছে গেছেন অথচ তাঁর আর কোনো খাবার নেই সেদিন এবং তিনি তখন ভিক্ষাতেও বেরোচ্ছেন না। তিনি তাঁর এঁটো মুড়ি সুধীরবাবুকে দিয়েছেন। তিনিও সেটাই নিঃসংকোচে খেয়ে নিয়েছেন। তথাকথিত এলিট্ লোক হলে কিন্তু এতখানি সহজভাবে মিশতে পারত না। সঙ্কোচ কাজ করত তার মধ্যে।

এসব এত খুঁটিয়ে আমি জানি না উনি এগুলো কোথাও বলেছেন কি না। দুটো বাতাসার একটা নিজে খেলেন সেই ফকির এবং অন্যটা সুধীরবাবুকে দিলেন। উনিও সেটাই খেয়ে থেকে গেলেন সারারাত। তবে উনি এই বাউলদের কাছে, ফকিরদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পেরেছেন। তাঁরা নিজেদের ধর্মের, কাজের, গানের যে গুহ্য কথা

সেগুলো তাঁকে বলেছেন। সুধীরবাবুর একটা বই আছে 'বাংলা গানের আলোকপর্ব' বলে। এটা ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন থেকে বেরিয়েছিল। ছোট্ট চটি বই। এখন সেটা অন্য বইয়ের মধ্যে ঢুকেছে। সেই বইটা আমার কাছে আছে। অনেক জায়গায় দাগ দেওয়া। আমি রেখে দিয়েছি। এই 'আলোকপর্ব' কথাটা ভাবলেই আমাদের মনের মধ্যে কীরকম একটা আলো জ্বলে ওঠে। সুধীর চক্রবর্তীর কাছে গেলে আমাদের সেরকম একটা অভিজ্ঞতা হতো।

১৯৮১ সালের একটা দুপুরবেলা প্রখর গ্রীষ্মে ঘরে যে খাটের ওপর বসতাম সেখানে বসে আছি। তখন উনি তৎকালীন বাংলা গানের সম্পর্কে বলছেন। এসব কথা পরে উনি লিখেছেন। কিন্তু আমি বলছি, তখন আমি ও আমার এক বন্ধু ছিলাম সেদিন। রানাঘাটেই থাকত সে। আমিও রানাঘাটেই থাকতাম তখন। ফলে যাওয়াটা সহজ হত। ৪৫-৫০ মিনিটে আমি কৃষ্ণনগর পৌঁছতাম। তারপর একটা রিক্সা নিয়ে বা বাস ধরে ওঁর বাড়ি চলে যেতাম। তো ওঁর বাড়িতে বসে উনি বলছেন, দ্যাখো আমাদের যে গান, সেখানে বাইরের রাস্তায় যে রিক্সা চালায় তার পরিশ্রমের কথাটা কিন্তু কোথাও নেই। এই যে বাস কন্ডাক্টর যে সারাদিন পরিশ্রম করে তার কথা কোথাও নেই। এই যে ছেলেমেয়েরা রাস্তায় আড্ডা দেয় সেসব কথা গানে নেই। রবীন্দ্রনাথের গান-ই হল আমাদের সেরা গান। কিন্তু তারপরে যে গান হয়েছে সেখানে হয়তো খুব সুকণ্ঠি গায়করা আছেন, খুব ভালো সুর রয়েছে, কিন্তু আমাদের কথা, আমাদের জীবনটা কীভাবে চলছে তার ছাপ কিন্তু কোথাও নেই। এই হল আমাদের গান ও তার কথা। একথা তিনি বলছেন '৮৯ সালে। এর ঠিক ১১ বছর বাদে আমাদের সামনে এসে পড়বেন সুমন। তাঁর 'তোমাকে চাই' নিয়ে। সুমনের গানে আমরা প্রথম বুঝতে পারলাম 'ছলাৎ ছল, ছলাৎ ছল, ছলাৎ ছল/ঘাটের কাছে গল্প বলে নদীর জল।' বাস কন্ডাক্টর, বা যে ছেলেটি রিক্সা চালাচ্ছে— এই যে জীবনটা, অর্থাৎ যে জীবনটা আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে যাপন করছি সেটা সুমনের গানে প্রথম ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে বাংলা গানের ধারাটা বদলে গেল। তো আমি এটা ওঁকে বলতে শুনেছি লেখবার আগে। এই প্রসঙ্গটা পরে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছিলেন। 'সুমন' বলে কারুর কথা আমরা তখনো জানি না। আমরা তখন প্রধানত শুনি পুরাতনী— রামকুমার বাবুর গলায়, তখন ক্যাসেটও বেরিয়েছে। আর রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী এগুলো প্রধানত শুনি। ঠিক বর্তমান সময় যেরকম বলতে চাইছে সেরকম কথা তখনও গানে শুনিনি। আর এক ধরনের আছে গণসংগীত, কিন্তু গণসংগীত এত সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে সে সময়টায় যে সেই গানের দিকে প্রধান সংখ্যক মানুষ যাচ্ছে না।

এটা আমার মনে আছে, উনি '৮০ সালে বলেছিলেন। তখন আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। হাসপাতালে ছিলাম। আর.জি.কর-এ অনেকদিন ভর্তি ছিলাম। তার মানে তার ১২ বছর পরে সুমন আসবেন। তখন সুমন আমাদের কোনো দিগন্তে নেই। কোথাও পূর্বাভাস নেই

যে সুমন আসতে পারেন। এখন আপনারা যাঁরা গান শুনছেন তাঁরা সুমনকে দেখার পর বা সুমন আসার পর তো আপনারা গান শুনছেন। এখন চালচিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কিন্তু আমি বলছি সুধীর চক্রবর্তী মানুষ হিসেবে কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভাবুন। যিনি '৮০ সালে বসে এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলা গান রুদ্ধ এবং সেখানে নতুন জোয়ার আসবে অন্তত আসা দরকার। আজকে এই কথাটার মধ্যে আর কোনো নূতনত্ব নেই। কারণ একজন এসে সেটা ভেঙে দিয়েছেন এবং তারপর আজকের ব্যান্ড পর্যন্ত এসে গেছে। একেবারে নতুন রকমের গান তৈরি হচ্ছে। স্বল্পবয়সী সব ছেলেমেয়েরা গান তৈরি করছে। তখন তো সেরকম ছিল না। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা গান তৈরি করত না। যেমনভাবে কবিতা লেখার চলটা ছিল, ছেলেমেয়েরা কবিতা লিখত, পত্রিকা বার করত ঠিক সেরকম ভাবেই ছেলেমেয়েরা এখন গান লিখছে, গানে সুর দিচ্ছে। একেবারে অন্য একটা ঢেউ এসে গেছে। তাদের জীবনে যা ঘটছে, সেই অনুভূতির কথা থাকছে।

এই পুরো জিনিসটা একজন মানুষ, ঘটনাটা ঘটবার বারো বছর আগে অনুমান করলেন যে এরকমভাবে চললে কিন্তু গানটা একটা বদ্ধ জলা হয়ে যাবে। এ থেকে মুক্তি এই সময়েই আসবার কথা। এই জিনিসটা কিন্তু অন্য দেশে আছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। আমাদের এখানে নেই। কিন্তু ব্যাপারটার এখানেই কিন্তু শেষ নয়। 'সুমনের গান, সুমনের ভাষ্য' নামে একটি বই— এখন সপ্তর্ষি প্রকাশনে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বইটি সপ্তর্ষি প্রকাশন গঠিত হওয়ার আগে প্রকাশ করেছিলেন সুধীর চক্রবর্তী এবং সুধীর চক্রবর্তী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রথম তাত্ত্বিক ভিত্তিতে সুমনের গান নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর একজন এরকম তাত্ত্বিক আলোচনা করেছিলেন তাঁর পরেই 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায়। তিনি হলেন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি উত্তরপাড়া, বালি ওইদিকে থাকেন। তিনি কবিতা লেখেন। কিন্তু সুধীর চক্রবর্তী আলোচনা করেছিলেন তার আগে। অর্থাৎ প্রথমে সুধীরবাবু ও পরে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি কবীরের অনুবাদ করেছিলেন। এঁরা সুমনের গানের ওপরে প্রথম তাত্ত্বিক আলোচনা করেন। অর্থাৎ তত্ত্বের দিক দিয়ে কী করে গানকে দেখতে হবে— এরকম সিরিয়াস প্রবন্ধ এঁরা দু'জন প্রথম লেখেন। প্রথম লেখেন সুধীর চক্রবর্তী এবং সেটা নিয়ে একটা বই তৈরি করেন। সেই বইয়ের প্রকাশনার যাবতীয় উদ্যোগও সুধীর চক্রবর্তী নিয়েছিলেন। সেটা সম্ভবত ধ্রুবপদ থেকে বেরিয়েছিল। এখন সপ্তর্ষি থেকে বইটা পাওয়া যায়। সুধীর চক্রবর্তী প্রথমে যে ভূমিকার প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেটি পরবর্তীকালে ওঁর আর অন্য কোনো বইতে যায়নি। কিন্তু আমরা সেটা পড়েছিলাম সেই সময়ে। এবং তখন সুমনের গান বেরিয়েছে বছর তিনেক হয়েছে। 'তোমাকে চাই' বেরোবার পর হয়তো তিন বছর কেটেছে। তার মধ্যেই উনি এই লেখা লিখেছেন। গান সম্পর্কে ওঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি ছিল। এক, আগেকার গান কেমন ছিল সেই সম্পর্কে জানা, দুই, বর্তমান গান কেমন— অর্থাৎ আমি ১৯৮০-৮৩ এই সময়ের কথা বলছি, আবার

ভবিষ্যতের গান কেমন হতে পারে সে বিষয়েও আভাস দেওয়া। এগুলো আমি '৮০ সালে একদম ওঁর মুখ থেকে শুনেছি। এইরকম একজন মানুষ যিনি গান সম্পর্কে এতখানি বলতে পারেন, তখনও কিন্তু তাঁর একটাও বই বেরোয়নি। 'সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাঁর গান', 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাঁদের গান', 'গভীর নির্জন পথে', 'নির্জন এককের গান: রবীন্দ্রসংগীত', 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়— স্মরণে বিস্মরণে', 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন'— এই দিকে যে যাওয়াটা— এগুলি কিছুই কিন্তু তখনো বাঙালি পাঠক সমাজের সামনে আসেনি।

একদিন এরকম একটা অনুষ্ঠান হবে, কলকাতা থেকে তিনজন গায়িকা আসবেন। গান গাইবেন। সম্ভবত সেটা আয়োজন হয়েছিল কৃষ্ণনগরের আলেখ্য স্টুডিওতে। সেখানেই ওঁর আড্ডা সন্ধেবেলা। ওখানে তখন অনেক অনুষ্ঠান হতো। সুধীর চক্রবর্তী সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে বলবেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। আমি গেছি। গায়িকারা তিন জনেই গান করেছেন। সুধীরবাবু আগে একটা ছোটো বক্তৃতা দিয়েছেন। মুখবন্ধ হিসেবে। সুধীরবাবুর যে সিরিয়াস বক্তৃতা— সেখানে উনি ডেমনস্ট্রেশান্ দেন, কী করে এই গানটা হয়, কী করে এই সুরটা হয়, যেমন— দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পর্কে বলেছেন, দিলীপকুমার রায় সম্পর্কে বলেছেন। এরকম বক্তৃতা অনেক শুনেছি। ছোটো একটি কথামুখ বললেন। তারপর ওই যে তিনজন গায়িকা গিয়েছিলেন, তাঁরা গান গাইলেন। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল সাড়ে সাতটার মধ্যে। পাঁচটা থেকে ছিল। তারপর সবাই থাকবেন একটা গেস্ট হাউসে। আমি সুধীর চক্রবর্তীর বাড়িতেই থাকতাম রাত্তিরে। তো আমরা সবাই সেই গেস্ট হাউসে সমবেত হলাম। ওঁরা তো গান-টান করেছেন। সুবীর সিংহরায় বলে একজন যুবক ছিলেন তখন ওখানে। তাঁকে এখন বহুকাল দেখি না। উনি হঠাৎ বললেন সুধীরবাবু আপনি একটা গান করুন। উনি প্রথমটা তেমন গা করলেন না। তারপর ওই যে মহিলারা ছিলেন তাঁরা বলতে লাগলেন— তাই নাকি! আপনি গান করেন নাকি! আচ্ছা করুন। একটা করুন। সুধীরবাবু তখন একটা কানে একটা হাত রেখে গান ধরলেন, ঝিঁঝিটের উপর। 'আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার/আজি সহসা ঝরিল চোখে কেন এ বারিধার।' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান। টপ্পাঙ্গের গান। তারপর গাইলেন 'কেন দুরাশ ছলনে ভুলি হইয়ে হৃদয়হরা/কেন মানব হইয়ে চাহি পিতে অমিয় ধারা।' একদম টপ্ খেয়ালের গান। একটা গান গেয়ে থামলেন না, চোখ খুললেন না। দ্বিতীয় গানটা গাইলেন। আমি তো স্তম্ভিত। আর সবচেয়ে আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেই গায়িকাদের। কারণ অতখানি খোলা গলায় তাঁরা কেউই গান করেননি। যে তিনজন গায়িকা গান করেছেন তাঁরা খুব সাবধানে স্বরলিপির উপর দিয়ে পদচারণা করেছেন। নিখুঁতভাবে রবীন্দ্রসংগীত উপস্থাপন করেছেন।

সুধীরবাবু যে দুটি গান গাইলেন সেটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান। তখন ১৯৮৩/৮৪। তাঁর গলার সেই দাপট, গায়কী ও নিখুঁত স্বরস্থাপনের স্থাপত্য কেউ ভাবতেও পারেনি।

গাওয়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয় গানটার পরে উনি যখন চোখ খুলেছেন তখন কেউ ভালো পর্যন্ত বলতে পারছে না। আমার জীবনের একটা খুব বড়ো দরজা সেই মুহূর্তে খুলে গেল। দিলীপকুমার রায়ের যে গায়কী তা আজ অবলুপ্ত। লুপ্তপ্রায় বলাটা ঠিক হবে না। লুপ্ত বলাই ঠিক। কিন্তু তখন তা ছিল লুপ্তপ্রায়। কারণ তখনও গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বেঁচে আছেন। সুধীর চক্রবর্তী তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র।

এরপর আমার কাজই হয়ে দাঁড়াল সুধীর চক্রবর্তীর কাছে পৌঁছানো এবং তাঁকে বারবার গাইতে অনুরোধ করা। গান নিয়ে যে উনি এত লিখলেন, সেই গানটা কিন্তু উনি মর্মে মর্মে জানেন। কারণ ওনার যে গান পরিবেশন ক্ষমতা, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার রায়ের গান সুধীরবাবু যেভাবে করতে পারতেন বা করতেন উপযুক্ত ও যথার্থ গায়কীর দ্বারা, সেই গায়কী এখন আর কারুর গলায় নেই। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে তা অনেকদূর ছিল। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেটা অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

পরবর্তী তাঁর ছাত্রছাত্রীরা কেউ কেউ সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন কিন্তু ওই ধারার গানের যে একটা ওজঃশক্তি থাকে, সেই ওজঃগুণটা তাঁদের কণ্ঠে নেই। সুধীর চক্রবর্তীকে আমি দেখেছি 'গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বরাঃ'— এই সংস্কৃত স্তোত্র বা 'না তাত না মাতা'— এই সংস্কৃত স্তোত্র ওঁদের বাড়ির খাটের উপর বসে গাইছেন। গলা নীচের ষড়জে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। গলা এতটাই নামাচ্ছেন উনি।

আমি তখন যাঁদের সঙ্গে মিশতাম কৃষ্ণনগরে তাঁরা একজনও আমাকে বলেননি যে ওঁর মধ্যে এইরকম গায়ন ক্ষমতা আছে। শুধু সংগীত নয়। সংগীতের ক্ষেত্রে এমন অনেক মানুষই আছেন যাঁরা ভালো গান গাইতে জানেন। কিন্তু সংগীত সম্পর্কে কোনো একটা দর্শনের জায়গা সেটা তাঁদের মধ্যে থাকে না। বেশিরভাগ মানুষ একটাই শিল্পের মধ্যে অবস্থান করেন। একটি শিল্পে কিছু পারদর্শিতা অর্জন করেন। সেই শিল্পেই কিছু খ্যাতি অর্জন করেন। ফলতঃ লোকে ধরেই নেয় অন্য শিল্পগুলো সম্পর্কেও তিনি অনেক কিছু জানেন। তাঁর ক্ষমতা না থাকলেও তিনি কোনো বিষয়ে একটা মন্তব্য করলেও সেটা খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যায়। তিনি নিজের শিল্পটি নিয়ে, নিজের পারদর্শিতা নিয়ে এবং তাঁর জন্য অর্জিত খ্যাতি নিয়ে আত্মতুষ্ট রয়ে যান। সুধীর চক্রবর্তী কিন্তু এর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জায়গায় থাকেন। ধরুন ফুলিয়াতে কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে প্রতি বছর একটা করে মেলা হয়। আপনারা তো জানেনই 'পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব' নামে বই আছে তাঁর। আজীবন কত যে মেলায় সুধীরবাবু ঘুরেছেন। মেলার মধ্যে যে লোকজীবন থাকে, মানুষের যে বিভিন্নরকম জীবনযাত্রা ও বৃত্তি থাকে তাকে খোঁজার জন্য। সেই বৃত্তির খোঁজেই উনি ভেণ্ডারের কম্পার্টমেন্টে ওঠেন। সেই বৃত্তির খোঁজেই উনি রিক্সাচালকের সঙ্গে গল্প করেন। সেই বৃত্তির খোঁজেই উনি ডেলি প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে গল্প করতে করতে আসেন। কিন্তু যখন উনি বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন হয়তো শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে

বক্তৃতা দিচ্ছেন। রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা অতুলপ্রসাদের গান নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কিন্তু যখন উনি মঞ্চ থেকে জীবনের মধ্যে ফিরে আসছেন তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই বৈচিত্র্যময় বৃত্তিসমূহের খোঁজ করতে শুরু করছেন আবার। একটা জিনিস ভেবে দেখা যায় আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে যদি মাটির নীচে যাওয়া যায়, অনেক নীচে তাহলে দেখা যাবে গরম লাভা, ধাতু সব ফুটছে। যাকে ম্যাগমা বলে। এটাই পৃথিবীর ভিত্তিমূল। তার উপরেই আমরা আছি। কিন্তু আমরা সেটা খেয়াল করি না। সুধীরবাবু এমন একজন মানুষ যিনি খেয়াল করেন, যে সমাজের থেকে তিনি বিভিন্ন পুরস্কার পাচ্ছেন, তিনি সেই সমাজের ভূত্বকের উপরে বসে আছেন। যেটা সমাজের মূল জায়গা, যেখানে ভূত্বকের অনেক তলায় ম্যাগমা আছে এবং তা ফুটছে, সেই জায়গাটার খোঁজ আমি সুধীর চক্রবর্তীর মধ্যে সারাক্ষণ, সারাজীবন দেখেছি। তাঁর লেখার মধ্যে সেটা ফুটে বেরিয়েছে একরকম করে এবং সেটাকে ধরতে সাহায্য করেছে তাঁর ব্যক্তিজীবনের একটা অত বড়ো ট্র্যাজেডি। সেটা বিষয়ে উনি অসচেতন থাকেননি। সেটা ভুলে যাননি। কর্তব্যগুলো উনি নিয়মিত পালন করেছেন। ওঁর জীবন আমাকে অনেক কিছু শেখায়। আমরা ওঁকে দেখতাম। কিন্তু কিছু কী শিখতে পারতাম? ওঁর গান শুনতাম। কিন্তু শিখতে পারতাম? বক্তৃতা শুনতাম। কিন্তু কিছুই শিখতে পারতাম না। শুধু জীবন যে কত বড়ো হয়, সেটা বুঝতে পারতাম। রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে হয়তো উনি দেখলেন কাজের লোক চলে গেছে। মেয়ে হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মেয়ের পরিচর্যায় নিজেকে নিবেদন করলেন।

ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম সারাদিন। আর ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত সংগীত একদিন গভর্নমেন্ট কলেজে গেছি। কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। চারটে বাজে। সবাই বাড়ি যাবে। আমি সুধীরবাবুর কাছে গেছি। বিরাট বড়ো বড়ো গরাদ দেওয়া জানলা। লম্বা লম্বা। আর উলটোদিকে অনেকখানি সবুজ জায়গা। দূরে গাছ। সবাই দরজা টরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যাবে। এইসময় মাঠের উলটো দিকে শ্যামল বনান্তের পেছন থেকে একখণ্ড মেঘ ভেসে আসছে। দেখতে দেখতে সেই মেঘ বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হল। খোলা জানলা দিয়ে ঝাপটা আসতে লাগল। সুধীরবাবু সেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে গভর্নমেন্ট কলেজের সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক, সকলের চোখে যিনি এলিট্ সেই বৃষ্টির ঝাপটের মুখে দাঁড়িয়ে জানলার গরাদ ধরে শুরু করলেন 'মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে/কখন বাদল ছোঁয়া লেগে, হা রে কখন বাদল ছোঁয়া লেগে।' কিছুক্ষণের মধ্যেই তখনো যে ক'জন অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছিলেন ওই খোলা গলার গান শুনতে দরজার পিছনে ভিড় করে এসেছেন। সুধীরবাবু ওইদিকে তাকিয়ে গেয়ে যাচ্ছেন। তখনই যেন রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি মুক্তি পেল। সবাই দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টিকণা ছুটে আসছে ঘরে। ওইখানে দাঁড়িয়ে উনি গান গেয়ে যাচ্ছেন। সেই মুহূর্তে ওই গানটা ওঁকে ডাকল আর উনি ওই গানটায় সাড়া দিয়ে উঠলেন। এগুলো এমন একটা মুহূর্ত যেগুলো থেকে যে শিক্ষা আমার নেওয়ার কথা ছিল সে শিক্ষা আমি আমার জীবনে

নিতে পারিনি। উনি তৎক্ষণাৎ একটা ইমপাল্‌সে সাড়া দিলেন যখন প্রকৃতি এগিয়ে আসছে। খুব চড়ায় ওঠে গানটা। ওই গানটা উনি খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে গাইছেন।

আবার এমনও হয়েছে যে হয়তো রাত আটটা বাজছে। তখন আমরা সবাই ঘরে বসে আছি। ওঁর মেয়ের খাওয়ার সময় হয়েছে। উনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে যাবেন ঠিক খাওয়াতে। উনি সে ব্যাপারে নিখুঁত। উনি লিখতে বসবেন হয়তো। উনি প্রতিদিন বারো পৃষ্ঠা করে লেখেন এখনও। হয়তো সন্ধ্যেবেলা লিখতে বসবেন। কোনো লোক এসেছেন। উনি উঠে লেখার ঘরে চলে যাবেন। ওঁর মূল কাজগুলি যেটা সেখানে কিন্তু উনি সমর্পিত। উনি যখন 'সদর মফস্বল' লিখলেন তখন আমরা অবাক হয়ে গেলাম— যে সুধীর চক্রবর্তীকে আমরা চিনতাম, তার আগের বারো বছর উনি যা লিখেছেন তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। একেবারে আলাদা। একেবারেই দৈনন্দিন মানুষের প্রত্যেকদিনের জীবনকথা ওর মধ্যে উঠে আসতে আরম্ভ করল। ইচ্ছা করলেই উনি উপন্যাস লিখতে পারতেন। লিখলেন না। অথচ এত অজস্র রকমের চরিত্রকে উনি দেখালেন ঝলকে ঝলকে। যতটুকু দরকার ততটুকু।

উনি একবার বারো বছর ধরে একটা কাজ করেছিলেন। 'ধ্রুবপদ' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকা প্রকাশের সময় উনি 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' বলে একটা সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। খুবই আশ্চর্য একটা ভাবনা। তা পত্রিকার পরিকল্পনা দেখলেই বোঝা যায়। 'গবেষণার অন্দর-বাহির' বলে একটা সংখ্যা বার করেছিলেন। 'বাউল ফকির' নিয়ে একটা সংখ্যা হয়েছিল। 'বাংলা গান' নিয়েও বেরোয় একটা সংখ্যা। এরকম আরও সংখ্যা বার করেছেন। ওই 'গবেষণার অন্দর-বাহির' ও 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' এই সংখ্যা দুটির পরিকল্পনা দেখলে বুঝতে পারা যায় কাকে বলা যায় গবেষণা। আমরা যাকে অ্যাকাডেমিকস্ বলব সেটা ওঁর বাইরের দিকের স্বভাবে নেই। কিন্তু ভিতর দিক থেকে কতটা আছে ওঁর কাজ দেখলে বোঝা যায়। সেটা উনি জানেন কীভাবে কাজটা করতে হয়। ওঁর সঙ্গে যখন মিশেছি দেখেছি উনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বরে নির্ভরশীল নন। কিন্তু সারা বাংলায়, এমনকী সারা ভারতবর্ষে কতরকমের দেবদেবীর মূর্তি আছে, কোনোটি ষড়ভুজ, কোনোটি চতুর্ভুজ, কোনোটি দ্বিভুজ, কোনোটি ত্রিভুজ— কতরকমের মূর্তি আছে, সেইসব মূর্তির যে গঠনরহস্য, গঠনের যে কারণ, কেন একটি মূর্তিকে এইভাবে তৈরি করা হল সেগুলি সম্পর্কে ওঁর জ্ঞান অপার। মন্দিরগুলি সম্পর্কে ওঁর আগ্রহ, কৌতূহল ও জানা অশেষ।

কেন উনি জেনেছেন এসব? যে মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, যে মানুষ দেবদেবীর পূজা করেন না সে মানুষ কেন বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির, বিভিন্ন মূর্তি এসব সম্পর্কে আগ্রহী? কারণ অগণিত সাধারণ মানুষ যুগ যুগ ধরে ঈশ্বর আর দেবদেবীদের কথা ভেবেছে। তাদের সৃষ্টি করেছে নিজ নিজ কল্পনায়। সেই যুগান্ত পার হয়ে আসা মানব-সাধারণকে জানতে গেলে তার দেবদেবীদের কথাও জানতে হবে। এভাবেই আমার ওঁকে যতটুকু

বোঝা তা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। অভিজ্ঞতার বাইরে যা তা আমি বলতে পারি না। আমি নিজের মনকেও প্রশ্ন করেছি কেন উনি এরকমভাবে এসব ব্যাপার সম্পর্কে জানেন। শেষ যেদিন ওঁর সঙ্গে দেখা হল সেদিন উনি সারাদিন আমায় অনেকক্ষণ বললেন বিভিন্ন মূর্তি নিয়ে। এইগুলো করে মানুষ, নিম্নবর্গের মানুষ, যারা মূর্তি বানায়। যে একটা ঘোড়ার মূর্তি তৈরি করল। এই যে দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করে— খুব নিম্নবর্গের মানুষ। এই যে মেলায় মেলায় গান— একটা মেলায় ঘুরলে আর কজন শঙ্খ ঘোষ দেখতে পাওয়া যায়! কজন রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী আর দেবদাস আচার্য দেখতে পাবেন! খুব বেশি হলে একটা। তাও পাঁচটা মেলায় ঘুরলে হয়তো একজন দেখতে পাওয়া যায়। মেলাটা ঘুরতে এসেছেন তাঁরা। মেলায় অংশগ্রহণ করছে যারা, যারা ওই মেলাটা করছে, মেলার মধ্যে রয়েছে, ওই মেলাটা যাদের জীবন— তাদের যদি জানতে চান তাহলে সুধীর চক্রবর্তীর কাছে যেতে হবে। সুধীর চক্রবর্তীকে আপনি সব মেলায় দেখতে পাবেন। এইভাবে ধীরে ধীরে আমার ধারণা হল উনি ওইসব কথা বলতে পারেন কারণ সুধীর চক্রবর্তী এই দেশটা দেখেছেন। আমাদের এই নিম্নবর্গ যে সমাজ, যারা ভেণ্ডার, আবার যারা মূর্তি তৈরি করে, যারা মাঠে মূর্তি বিক্রি করে, যারা রিক্সা চালায় এদের একেবারে কাছ থেকে দেখেছেন উনি। এরাই তো দেশ। তাই উনি যখন কথা বলেন আমি চুপ করে শুনি। উনি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোনো ধর্মে বিশ্বাস করছেন না। আমি মনে করি, সেবা হল ওঁর ধর্ম, সংগীত হল ওঁর ধর্ম এবং শিক্ষাদান হল ওঁর ধর্ম। আমি এতদিন ধরে মিশে এটাই বুঝেছি। আর একটা ধর্ম ওঁর আছে। সেটা হল বন্ধুধর্ম। সুধীর চক্রবর্তীর কাছে সব বয়সের মানুষ আসেন। সব বয়সের মানুষের সঙ্গে উনি কৌতুক করেন। কিন্তু কৌতুক করলে একটা সমস্যা হয় কী অন্য সকলে মনে করেন এই মানুষটি লঘু। উনি কিন্তু এটাকে পরোয়াই করেন না। কেউ আমাকে লঘু মনে করল, কেউ আমাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করল, কেউ আমাকে শিক্ষিত ভাবল, কেউ অতি সাধারণ ভাবল এর কোনো দাম ওঁর কাছে নেই। উনি নিজে নিজের সম্পর্কে কী মনে করেন সেটাই মূল ব্যাপার।

আমি আমার জীবনে একবার খুবই দারিদ্র্যের মুখে পড়েছিলাম। তখন আমার মা মারা গেছেন। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমি বিনা টিকিটে সুধীরবাবুর কাছে যেতাম। ওঁর গানের আকর্ষণ খুবই প্রবল। একটি কথা আগে লেখা ভালো। কৃত্তিবাস ওঝা যিনি বাংলায় রামায়ণ লিখেছিলেন তাঁর জন্মস্থান ফুলিয়ায়। সেখানে প্রতি বছর একটা মেলা হয়। সে মেলায় কবিসম্মেলন হয়। কৃত্তিবাস ওঝা-র জন্মদিনে রানাঘাট, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, বাদকুল্লা, চাপড়া, ফুলিয়ায় যত লোক লেখালিখি করে সব গিয়ে ওই জায়গায় জমা হয়। তারপর তারা দু'টি একটি করে কবিতা পড়ে। সুধীরবাবু তখন প্রতিষ্ঠিত লেখক। 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'বারোমাস', 'এক্ষণ'-এ ওঁর লেখা প্রকাশ হয় নিয়মিত। কত বড় বড় সম্পাদক ওঁর লেখা ছেপেছেন। সাগরময় ঘোষ, নির্মাল্য আচার্য, অশোক সেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ওঁর বইয়ের

তখন রিভিউ করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অশোক মিত্র। তখন এগুলো হচ্ছে। তখন উনি আর শুধু গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপক নন। শিরোমণি পুরস্কার পেয়ে গেছেন। লক্ষ করলে দেখা যায় বিশেষ একটি প্রকাশনা থেকে ওঁর বই বেরোচ্ছে এমন নয় কিন্তু। সমস্ত প্রকাশনা থেকে ওঁর বই বেরোয়। তো ওই ফুলিয়া থেকে সবাই ফিরছে। বাস রাস্তায় যাবে। রাস্তায় সব দল বেঁধে বাসে উঠবে। তাদের মধ্যে একজনই বয়স্ক লোক আছেন। তিনি হলেন সুধীর চক্রবর্তী। ফিরতে ফিরতে খোলা মাঠ দেখল সবাই চোখের সামনে। সবাই ঠিক করল এখানে গোল হয়ে বসে গল্প করা হবে। এখানে আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প করব, কবিতা পড়ব। একটা চায়ের দোকানও নেই কিন্তু কোথাও। বিড়ি আছে, সিগারেট আছে। আর কোথাও কিছু নেই। কিন্তু সুধীরবাবু ধূমপান করেন না। অথচ তিনি ওইসব ছেলেদের সঙ্গে ওখানে বসে পড়লেন। তারা প্রত্যেকে ওঁর থেকে বয়সে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ বছরের ছোটো। আমার থেকেও ছোটো ছেলেপুলে আছে। মাঠে গোল হয়ে বসলেন। তারপর কেউ কবিতা পড়ল, কেউ গল্প করল, সুধীরবাবু সারাক্ষণ উপস্থিত রইলেন এবং সেখানে অনেক গল্প করলেন। তারপর আবার ফিরে আসা সেই ধানখেতের মাঝখান দিয়ে। আমরা সবাই ফিরে এলাম। সুধীর চক্রবর্তীর কি সময়ের কোনো দাম নেই? তখন তাঁর বয়স ৫৭-৫৮ হবে। আর বেশিরভাগ ছেলেই ছিল ওখানে বেকার। কিন্তু এইটাই ওঁর সময়। উনি একরকম মানুষের সঙ্গে মিশছেন না। যেমন বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে ওঁর বই বেরোচ্ছে। উনি কোনো একটা জায়গায় আটকে নেই। উনি যে বিশেষ কোনো একটা মেলাতেই শুধু প্রতি বছর যাচ্ছেন তা নয়, উনি সব মেলা ঘুরে দেখেছেন। তেমনি উনি সব রকম মানুষের সঙ্গে মিশছেন। মানুষের সমস্ত রকম স্তরের সঙ্গে মিশছেন। বিশেষ কোনো ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশছেন তা নয়। এ আমার চোখের সামনে দেখা।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল উনি কখনও কোনো খবরের কাগজে বা সাহিত্যপত্রে কর্মী হিসেবে যোগ দেননি। ওঁর কিন্তু সেই সুযোগ যথেষ্ট ছিল। কিন্তু উনি সেটা করেননি। এমনও হয়েছে ওঁর 'বাংলা গানের চার দিগন্ত'-এর মতো প্রবন্ধ একটি বিখ্যাত কাগজ থেকে দেরি হচ্ছিল ছাপতে, উনি তুলে নিয়ে চলে এসেছেন। প্রবন্ধ বলতে এখন আমরা বুঝি কোনো সংবাদপত্রের চারের পাতায় বা সাময়িক পত্রিকায়— যেগুলি রবিবার বেরোয় বা পাক্ষিক প্রকাশিত হয় সেখানে সাতশো-আটশো শব্দের একধরনের রচনা। আমরা এখন সেটাকেই প্রবন্ধ বলে মনে করি। যেমন— ধ্রুপদ গান এখন দিনে দিনে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তেমনি সত্যিকারের সিরিয়াস প্রবন্ধ এখন কম লেখা হয়। কারণ পাঠকের দিকে তাকিয়ে যদি লিখতে হয় এবং পত্রিকা যখন বলে পাঠক লঘু লেখা চাইছে— তখন প্রবন্ধকে লঘু করে দিতে হয়। লেখকরা সেভাবেই লিখতে থাকেন। সব যুগেই এরকম লেখক পাওয়া যায়। এখন মোটামুটি এমন লেখাকেই আমরা প্রবন্ধ বলে ধরি। প্রবন্ধ বলতে আজকাল তাই বুঝি। লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা বিষয়ে চারপাতা ছ'পাতার রিভিউ। ধরা যাক আশির দশকের বাংলা কবিতা। সে

বিষয়ে লেখা ছাপা হল, দু'পাতা বা দশপাতা। তাতে বিভিন্ন লেখকের দু'লাইন/চার লাইন উদ্ধৃতি রইল এবং সে-সম্পর্কে একটা মন্তব্য রইল। এটি মন্তব্য প্রসার মাত্র, প্রবন্ধ নয়। ধাপে ধাপে যেমন ধ্রুপদ একটা রাগকে খুলে ধরে, কিন্তু আজকাল কলকাতায় যেসব অনুষ্ঠান হয় সে রকম ধ্রুপদ গায়ক ক'জন দেখতে পাওয়া যায়? ঠিক সেরকম প্রবন্ধও ধীরে ধীরে কমে আসছে। কারণ সাময়িক-পত্র নির্ভর পড়াশোনা ও লেখালেখি বেড়ে গেছে। অল্প কয়েকজন আছেন, যেমন— শিবাজী বন্দ্যোপাধায়, সুধীর চক্রবর্তী। ভারি প্রবন্ধ যাঁরা লিখতে পারেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির নাম সুধীর চক্রবর্তী। এখন কথা হল এঁরা কি সংবাদপত্রে আটশো শব্দের বুক রিভিউ লেখেন না?

এখন ঘটনা হল জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর শ্রী রাগের উপর একটা রেকর্ড আছে। আড়াই মিনিটের রেকর্ড। 'জয় যোগীশ্বর ভোলা মহেশ্বর।' আব্দুল করিমের একটা রেকর্ড আছে। তিলক-এর উপর। 'সজনাঁ তুঁনে কাঁহে কো নেহা লাগা।' বা ফৈয়াজ খাঁর একটা রেকর্ড আছে। ভৈরবীর উপর। টোড়ি-র উপর আছে। নীলাম্বরী আছে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের। এগুলি ছোটো রেকর্ড। কিন্তু আড়াই-তিন মিনিটের রেকর্ডেও দেখা যাবে রাগের রূপটা কী অপূর্বভাবে প্রতিষ্ঠা করছেন এঁরা। ওর থেকে বেশি সময় তখন দেওয়া হত না রেকর্ডে। শিল্পীদের ওপর থেকে বড়ো রেকর্ড হত না তখন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী দুটো লাইনের মধ্য দিয়ে পুরো রূপটা ফুটিয়ে দিলেন শ্রী-র। কিংবা 'যমুনাকে তীর' একটা লাইনের মধ্য দিয়ে দেড় মিনিটে ভৈরবীর রূপটা তুলে দিলেন আব্দুল করিম। এঁরা যেসময়ে গান শিখেছিলেন— ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বা ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ— তখন একটু শিখে স্টেজে গাইতে বসে যাওয়া অথবা আমি সব বিষয়ে জানি এই ধারণাটা আসেনি। আমাদের সময়ে এল। সেসময়ে আসেনি। তাঁদের তালিমটা ছিল দীর্ঘ। অনেকদিনের পরিশ্রম, রেওয়াজ থাকত তাঁদের। সেই দীর্ঘ তালিমের ফলে কী হয়েছে? গাইবার যে সময়সীমা তা যতই কম হোক রাগের রূপ ওঁরা ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। সুধীর চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ এঁদের লেখার তালিম ও রেওয়াজ যে সময়কার তাতে এঁরা যদি সংবাদপত্রে একটা সাতশো শব্দের প্রবন্ধ লেখেন, বুক রিভিউ লেখেন, তাহলে তার মধ্যেও প্রবন্ধের ধর্ম ও মেজাজ ঠিকই প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। তার কারণ ওঁদের তালিম। তার কারণ এঁরা সাময়িক পত্র নির্ভর লেখালিখি পড়ে নিজেরা কী লিখব কোথায় লিখব, সেই ধারণাটা তৈরি করেননি। আজকে আমাকে বাংলা গান নিয়ে লিখতে বলল, আমি বাংলা গান নিয়ে লিখলাম, তারপরে আমাকে বলল সমকাম যে অপরাধ বলে ঘোষিত হল সে বিষয়ে লিখতে, আমি লিখলাম, তার পরের সপ্তাহে আমাকে বলল বইমেলা নিয়ে লিখতে আমি লিখলাম। তার এক সপ্তাহ পরে আমাকে বিবেকানন্দ নিয়ে লিখতে বলল, আমি বিবেকানন্দের সার্ধ শতবর্ষ বিষয়ে লিখলাম। আবার দু'সপ্তাহ পরে আমি বাজারদর নিয়েও লিখলাম।

এই যে আমি সব বিষয়ে লিখতে পারি এবং ওই চারের পাতা যাঁরা সম্পাদনা করেন তাঁরা এসে আমাকে বলেন তোমার লেখাটা ভাল হয়েছে— আমি কিন্তু লেখক হয়ে গেলাম। ঠিক এই রকমের তালিমের মধ্য দিয়ে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, আব্দুল করিম খাঁ সাহেব, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী এঁরা আসেননি। ঠিক তেমনই সুধীর চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়-ও এই তালিমের মধ্য দিয়ে আসেননি। এঁরা রেওয়াজ করেছেন।

সুধীর চক্রবর্তী পঞ্চাশ বছর সময় নিয়েছেন জীবনের প্রথম বইটা বার করার জন্য। সুতরাং আমরা যদি একটা সংবাদপত্রে সুধীরবাবুর লেখা পড়ি, সেখানে কোন্ কাগজে ওঁর লেখা বেরোচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গোলাম আলি খাঁ সাহেব তিন মিনিটের একটা রেকর্ড করছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তিনি গোলাম আলি খাঁ সাহেব। তার সংগীত চিন্তন ওইটুকুর মধ্যেই প্রকাশ পায়। এইখানেই নিহিত আছে এঁদের অমরত্বের কারণ।

আমি যখন নিজে খুব দুরবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম তখনও আমি ওঁর কাছে ছুটে যেতাম। কারণ, আমার জীবনের নেশা হচ্ছে গান। আর আমার মনে হতো, এমন একজনকে দরকার, যাঁর কাছ থেকে আলো পেয়ে আমি একটু বাঁচব। সবসময়ে যদি মনের মধ্যে দারিদ্র্য নিয়ে চিন্তা থাকে, সেটা তো আমাকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেবে। সেইজন্য আমি ওঁর কাছে চলে যেতাম। এছাড়াও যাঁরা সংগীত সম্পর্কে জানেন বা ভালো গান গাইতে পারেন এরকম মানুষদের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি জীবনে। সেটা লেখালিখির কোনো কারণে নয়। সুধীর চক্রবর্তীও লেখালিখি করেন সেটা একটা দিক। উনি কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে কোনোদিন আমাদের কোনো জ্ঞান দিতেন না। কখনোই আমাকে কিছু শেখাতেন না।

সুধীর চক্রবর্তী প্রসঙ্গে ফিরে আসি আবার। লক্ষ করলে দেখা যায় উনি কবিতা নিয়ে কত লিখেছেন। আমি ওঁর কাছে যেতাম। অনেক কথা বলতাম, একসঙ্গে থাকতাম। কখনো কখনো রাত্রে থেকে যেতাম। আবার বাড়ি ফিরতাম। উনি জানতেন যে আমি বিনা টিকিটে আসি। উনি আমাকে রিক্সা করে স্টেশনে পৌঁছে দিতেন এবং দাঁড় করিয়ে রাখতেন আমাকে। বলতেন— তুমি দাঁড়াও, আমি টিকিটটা কেটে আনছি। আমি বলতাম— না, না টিকিট কাটার দরকার নেই। উনি বলতেন দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি টিকিট কেটে আনছি। অনেক সময় বলতেনও না। বলতেন— দাঁড়াও, আসছি বলে টিকিট কেটে আনতেন। তারপর আমার জামার পকেটে টিকিটটা ঢুকিয়ে দিতেন। দেওয়ার সময় একটা একশো টাকার নোট ঢুকিয়ে দিতেন। '৮৪ সালে কিন্তু একশো টাকা অনেক। এইবার আস্তে আস্তে আমার জীবনে বদল এল। আমি কলকাতায় চাকরি করি। বিভিন্ন পুরস্কার কমিটিতে ঢুকলাম। যাকে বলে মান্যগণ্য হলাম আর কি! ১৯৯৮ সাল তখন, কলকাতার একটা বড় পুরস্কার কমিটি। যেসময়ের কথা বলছি, তখন আমি প্রথম সেই কমিটিতে গেছি। সেখানে যাঁরা রয়েছেন সবাই আমার সিনিয়র সাহিত্যিক। অনেক পুরোনো পুরোনো লোকজন সব।

আমি সবচেয়ে নতুন। সেখানে সুধীর চক্রবর্তীর দুটো বই এসেছে। আমাকে বলে দেওয়া হল যে পুরস্কারের জন্য আমাকে কোন বইটার নাম বলতে হবে এবং যে বইটার কথা আমাকে বলতে হবে তা সুধীর চক্রবর্তীর দুটো বই-এর মধ্যে একটাও নয়। আমি সেই বইটার নামই বললাম। কারণ বড়রা বলেছেন আমাকে। আমাকে তো বড়দের তুষ্ট রাখতে হবে। বইটা পুরস্কার পেয়ে গেল। তারপর আমরা সবাই বেরিয়ে এসেছি। সব সিনিয়র সাহিত্যিকরা রয়েছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন সাহিত্যিক আজ প্রয়াত। তাঁরা আলোচনা করছেন এর মধ্যে কিন্তু সুধীর চক্রবর্তীর বই ছিল।

এদের মধ্যে একজন সাহিত্যিক বলছেন— 'হ্যাঁ, কী ফিল্ড ওয়ার্ক আর কী ভাষা!' আর একজন বলছেন ওঁর তো কোনো তুলনাই হয় না। উনি পরের বছর ঠিকই পাবেন। আমি চুপ করে বসে রয়েছি। আমার মনে পড়ছে আমার মা যখন মারা গিয়েছেন, আমার কাছে একটা টাকা নেই, আমি বিনা টিকিটে যাতায়াত করছি, তখন উনি কিন্তু আমার পকেটে টিকিট এবং টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

আমি দেখেছি ওঁর সাধনাটা। উনি বাড়িতে কীরকমভাবে পরিচর্যা করেন ওঁর মেয়ের। কিন্তু আমি কিচ্ছু বলছি না। আমি নিজেকে আর বলতে পারব না আমি ওঁর লেখার অনুরাগী। সেদিনই সেই অধিকার আমি হারিয়েছি।

এরপর একদিন সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার দেখা হল। আমি নিজে তাঁর কাছে সব বললাম। এই যা যা হয়েছে। আমি অন্য বইকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য সই করেছি। বললাম। আমাকে বলতে বলা হয়েছিল সেই বই পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু উনি কি শুনে আমার উপর ক্ষুব্ধ হলেন? উনি কি বললেন আমি একজন অকৃতজ্ঞ? উনি কিছুই বললেন না। উনি বললেন এইসব হয়। এগুলোর কোনো মূল্য আছে বলো! এই পুরস্কারটা পেলেই বা কী হতো! ছাড়ো তো ওসব। এগুলো নিয়ে মন খারাপ কোরো না। বলেই উনি তার আগের দিন যে-মেলা থেকে ফিরেছেন— সেই মেলার গল্প বলতে লাগলেন। উনি এরকম ভাবেই এসবকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কিন্তু আমি অন্তর থেকে জানি উনি সারাজীবন নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো কাজ করেন না। উনি কোনো বিশেষ পত্র-পত্রিকা বা প্রকাশনার সঙ্গে কোনোদিনই সর্বৈবভাবে যুক্ত নন।

এই যে এত বড়ো রাজনৈতিক যজ্ঞটা হয়ে গেল— কেউ কী একদিনও দেখেছে যে সুধীর চক্রবর্তী কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে বসে কোনো বিষয়ে মতামত দিচ্ছেন? সংগীত, লোকধর্ম, রবীন্দ্রনাথ, বাউলগান— যা ওঁর বিষয়, যা শিল্প, তার বাইরে কোথাও কোনো মতামত দেননি। উনি নিজের 'সা'-কে সবসময় ধরে রেখেছেন। ওটাই ওঁর 'সা'। আর গায়কের যদি 'সা'-ছুট হয়ে যায় তাহলে তার সব ছুট হয়ে গেল। তা সে যতই প্রতিষ্ঠানবিরোধী হোক। কিন্তু এত যে টালমাটাল গেল সুধীর চক্রবর্তী কোথাও যাননি। আমি জানি, আরও

একটা কথা— যা বললে হয়তো সুধীরবাবু ক্ষুণ্ণই হবেন আমার উপর। তবু আমি বলে রাখি। ওঁর কাছে কিন্তু বড়ো ধরনের প্রস্তাব গিয়েছিল। যে আপনি আসুন এবং টেলিভিশনে নিয়মিত বলুন। উনি কিন্তু বলেননি। অথচ ওঁকে যদি কেউ বলেন আপনি লালন বিষয়ে আমাদের গ্রামের ইস্কুলে এসে বলুন, তা কিন্তু উনি বলবেন। ওঁর নিজস্ব অনেক শ্রোতা ও পাঠক তৈরি হয়েছে। তরুণ, অতি তরুণ পাঠক। প্রবীণ পাঠক। তারা ঠিক করে নেয় যে আজ আমি সুধীর চক্রবর্তীর বক্তৃতা শুনতে যাব। তিনি আজ লোকধর্ম বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিয়ে বলবেন। মানুষ এক্ষেত্রে মনস্থির করে নেয়। যায়, বসে এবং পুরোটা শোনে। অর্থাৎ উনি নিজের এই স্বাধীনতাটা রেখেছেন যে আমি যেটা বলব সেটা যে শুনতে চাইবে সেই শুধু শুনতে পাবে। নিজেকে শুধু নিজের কাজের কাছে নিবিষ্ট, একাগ্র রেখেছেন।

শ্রুতিলিখন: মৌলি তরফদার

---

হাড্রেড মাইলস ২০১৪